ভারতে আর্থিক বৈষম্যের ধরণ ও কারণগুলি ব্যাখ্যা কর।

বৈষম্য বলতে বোঝায় এমন একটি সামাজিক পরিস্থিতি যেখানে কিছু মানুষের সুযোগ, সুবিধে, অধিকার সমাজের বেশিরভাগ মানুষের তুলনায় বেশি।

আর্থিক বৈষম্যের ধরণ –

আর্থিক বৈষম্য বলতে বোঝায় কোনও দেশ বা সমাজের এমন একটি অর্থনৈতিক কাঠামো ও পরিস্থিতি যার ফলে এবং যেখানে দেশের আয়ের এবং সম্পদের মালিকানার বড় অংশই মুষ্টিমেয় মানুষের কুক্ষিগত এবং তুলনায় দেশের গরিষ্ঠসংখ্যক মানুষের আয় ও সম্পদের মালিকানা অতি নগণ্য। অর্থাৎ, এ এমন এক পরিস্থিতি যেখানে হাতে গোনা কয়েক জন প্রবল ধনীর পাশাপাশি অবস্থান করে বিপুল সংখ্যক দরিদ্র মানুষ।

ফলত, আর্থিক বৈষম্যকে দুটি মূল ভাগে শ্রেণিবিভক্ত করা যায় – ১) আয়ের বৈষম্য; ২) সম্পদের বৈষম্য। এই দুটি বৈষম্য এবং ভারতে কিছু সামাজিক বৈষম্যের কারণে দেখা দেয় – স্বাস্থ্য ও শিক্ষার বৈষম্য, পুষ্টির বৈষম্য, লিঙ্গ বৈষম্য, আঞ্চলিক বৈষম্য এবং জাতপাতের বৈষম্য।

ভারতে মাত্র ১০ শতাংশ মানুষের হাতে আছে দেশের সম্পদের প্রায় ৭৮ শতাংশ। তাদের মধ্যে আবার মাত্র ১ শতাংশের হাতেই আছে দেশের মোট সম্পদের ৫২ শতাংশ। ব্যক্তিগতভাবে ১০০ কোটি বা তার বেশি আর্থিক মূল্যের সম্পদের মালিক যারা তাদের মোট সম্পদের পরিমাণ কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটের ব্যয়ের চেয়ে বেশি। অন্যদিকে, আর্থিক সম্পদের বিচারে নীচের দিকের ৬০ শতাংশ মানুষের মালিকানায় আছে দেশের মাত্র ৫ শতাংশ সম্পদ। ভারতের ৫০ শতাংশ মানুষের একযোগে যে সম্পদ আছে তার সমান সম্পদের মালিক দেশের সবচেয়ে ধনী মাত্র ৯ জন কোটিপতি।

ভারতে আর্থিক বৈষম্যের কারণ –

১) বেকারত্ব – ভারতে আর্থিক বৈষম্যের প্রধান কারণ বেকারত্ব, আধা বেকারত্ব, প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব এবং নিম্ন উৎপাদনশীলতা। শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা কম হলে অর্থনৈতিক উন্নতি তথা জাতীয়

আয়বৃদ্ধির হারও কম হয়। আয়বৃদ্ধির হার কম হলে বিনিয়োগের হারও কম হয়, কর্মসংস্থান বাড়ে না অর্থাৎ, শ্রমিকের চাহিদার তুলনায় জোগান বেশি দেখা যায়। ফলত, মজুরি অর্থাৎ বাড়ে না।

২) দামবৃদ্ধি – আর্থিক বৈষম্যের আর একটি কারণ হল লাগাতার পণ্যের দামবৃদ্ধি। পণ্যের দামবৃদ্ধি ঘটলে অর্থের মূল্যে আয় যত, বাস্তব আয় তার থেকে কমে যায়। কারণ, দামবৃদ্ধি ঘটলে টাকার মূল্য কমে, ফলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়। গরিবের বাস্তব আয় ও সম্পদ বাড়ে না। অথচ, বড় সংস্থার মুনাফা অর্জনকারীদের আয় ও সম্পদ বাড়ে। কারণ, দামবৃদ্ধি যে হারে ঘটে, মজুরি সেই হারে বৃদ্ধি পায় না। ফলে, মুনাফা বাড়তে থাকে। সুতরাং, যে কারণে মজুরের আয় ও সম্পদ কমে, সেই কারণেই পুঁজিপতির আয় ও সম্পদ বাড়ে। এই ঘটনার তীব্রতা বিশেষ করে অনুভূত হয় অসংগঠিত ক্ষেত্রে। সংগঠিত ক্ষেত্রে তবু মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে কিছু চুক্তি থাকে, মহার্ঘভাতার ব্যবস্থা থাকে, কর্মীদের বিমা এবং আরও কিছু সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকে। অসংগঠিত ক্ষেত্রে সেসব কিছুই থাকে না। ফলে,অর্থনীতির সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের মধ্যেও বৈষম্যের সৃষ্টি হয়।

৩) কর ফাঁকি দেওয়া – দেশের ধনী মানুষ ও সংস্থাগুলির একটি বড় অংশ নানান কায়দায় কর ফাঁকি দেয়। এটি আর্থিক বৈষম্য তৈরির একটি বড় কারণ। সরকারের রাজস্ব বাড়লে সরকার দরিদ্র ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের মানুষদের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করতে পারে, সরকারি ব্যয়ের মাধ্যমে তাদের কাছে আয় ও সম্পদের আংশিক হস্তান্তর ঘটাতে পারে। কিন্তু, ধনীরা কর ফাঁকি দিলে সেই কাজ সম্পন্ন হয় না। উপরন্তু, ধনীদের হাতে কর ফাঁকি দেওয়ার কারণে যে কালো টাকা জমে তা এক সমান্তরাল অর্থনীতির সৃষ্টি করে যার হিসাব সরকার পায় না। এভাবে ধনীদের হাতে আরও বেশি আয় ও সম্পদ ঘনীভূত হতে থাকে। ফলত, বৈষম্য বাড়ে।

৪) করকাঠামোর পশ্চাদ্‌মুখি চরিত্র – ভারতে সরকারের রাজস্বের প্রধান অংশ আসে অপ্রত্যক্ষ কর থেকে। এই করকাঠামো বহুলাংশে পশ্চাদ্‌মুখি অর্থাৎ, সাধারণের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ও তুলনায় অপ্রয়োজনীয় ও বিলাসবহুল পণ্যের উপরে বসানো করে বিশেষ প্রভেদ নেই। উদাহরণস্বরূপ, সাধারণ জামাকাপড়ের উপরে যে কর ধার্য করা হয় সেই একই হারে কর ধার্য করা হয় বিলাসবহুল জামাকাপড় এবং পার্টি ড্রেসের উপরে। এর ফলে গরিবকে প্রতিদিন পরার সাধারণ একটি সস্তা জামা কিনতে যে হারে কর দিতে হয়, একজন ধনী মাসে একদিন পরার একটি দামী জামা কিনতে সেই একই হারে কর দেয়।

৫) নয়া কৃষি কৌশল (সবুজ বিপ্লব) – তথাকথিত সবুজ বিপ্লবের কারণে বড় চাষী ও ছোট চাষীর মধ্যে বৈষম্য এবং আঞ্চলিক বৈষম্য ভয়াবহ হারে বেড়েছে। সবুজ বিপ্লবে যে বীজ, সার, কীটনাশক, বিভিন্ন যন্ত্র তথা যে কৃষিকৌশল ব্যবহার করা হয় তার ব্যয় বহন করার ক্ষমতা সকলের নেই। একমাত্র বড় এবং ধনী চাষীরাই এই কৌশল প্রয়োগ করে ফলন বাড়াতে পারে। এর ফলে, বড় চাষী আরও ধনী হয়েছে। অথচ, ছোট চাষীরা দরিদ্রই থেকে গেছে। সবুজ বিপ্লবের ফলে আঞ্চলিক ক্ষেত্রেও আয় ও সম্পদের বৈষম্য ঘটেছে। প্রথমত, এই কৃষিকৌশল মূলত প্রগতি এনেছে গমের ক্ষেত্রে। ফলে যেসব অঞ্চলে ধান চাষ করা হয় সেই অঞ্চলগুলি এ থেকে তেমন লাভবান হতে পারেনি। দ্বিতীয়ত, এই কৃষিকৌশলে জলের প্রয়োজন হয় অনেক বেশি। ফলে, যেসব অঞ্চলে সেচব্যবস্থা উন্নত কেবল সেই অঞ্চলগুলিই এতে লাভবান হয়েছে। তৃতীয়ত, যেসব রাজ্যে জোতের পরিমাণ বড় সেই সব অঞ্চলে সবুজ বিপ্লব সফল হতে পেরেছে। কিন্তু, যেসব অঞ্চলে জোতের পরিমাণ মাঝারি কিংবা ছোট সেসব অঞ্চলে সবুজ বিপ্লব চাষের ফলন ও কৃষকের আয় বাড়াতে ব্যর্থ হয়েছে।

৬) ত্রুটিপূর্ণ সরকারি নীতি – পূর্বে ভারতীয় করব্যবস্থার ত্রুটি উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও সরকারের দারিদ্রদূরীকরণ নীতিগুলিও দীর্ঘকালীন লক্ষ্যে সম্পূর্ণ সফল হতে পারেনি কারণ, নীতিগুলির ধারাবাহিকতার অভাব। বিশেষত, গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানের লক্ষে যে পরিমাণ বরাদ্দ প্রয়োজন তার চেয়ে কমই বরাদ্দ হয়েছে। গ্রামীণ ঋণদান নীতির ক্ষেত্রেও সরকার দরিদ্র কৃষক, দিনমজুর ও স্বরোজগারী মানুষের পাশে দাঁড়াতে ব্যর্থ হয়েছে। মূলত বড় চাষীরাই বেশি ঋণগ্রহণ করে থাকে। ফলে, ঋণমকুবের যাবতীয় সুবিধে তারাই পেয়েছে। কৃষিক্ষেত্রের যেসব উপাদান যথা, সার, কীটনাশক ইত্যাদিতে যে ভর্তুকি দেওয়া হয়েছে তার সুফল ধনী চাষীরাই ভোগ করেছে। পুঁজিহীন দরিদ্র কৃষক এবং ছোট জোতের মালিক এই ভর্তুকির সুবিধে পায়নি।

৭) সরকারি কাঠামো ও রাজনৈতিক বৃত্তের দুর্নীতি – স্বজনপোষণ, ঘুষ নেওয়া, দরিদ্রের জন্য বরাদ্দ টাকা আইনের ফাঁক দিয়ে লুঠ করা ইত্যাদি কারণে সরকারি বরাদ্দের একটা বড় অংশ দরিদ্র বা যাদের জন্য বরাদ্দ তাদের কাছে পৌঁছয়নি। সরকারের টাকায় ধনী হয়েছে মুষ্টিমেয় প্রভাবশালী যাদের দুর্নীতিপরায়ণ পরগাছা বলা যায়। ফলত, দরিদ্র দরিদ্রতর হয়েছে, আয় ও সম্পদের বৈষম্য বেড়েছে।

৮) ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দীর্ঘকাল হতে চলে আসা ব্যাধির মতো রাজত্ব করে চলেছে জাতপাতের বিচার। জোর জবরদস্তি করে তথাকথিত নীচু জাতের মানুষকে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। উচ্চবর্ণের আপত্তি ও বিরোধিতার ফলে তাকে স্কুলে যেতে দেওয়া হয় না, সরকারি দফতরে তার প্রবেশাধিকার নেই, ব্যাংকে আবেদন করার সুযোগ নেই। নিরক্ষর নিম্নবর্ণ দরিদ্র এভাবেই আয় ও সম্পদের নিরিখে হীন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে।

আয় ও সম্পদ তথা আর্থিক বৈষম্য ঘোচানোর উদ্দেশ্যে সরকার ও সৎ ব্যক্তিদের দীর্ঘকালীন ধারাবাহিক উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন এবং সরকারি নীতিগুলি আরও স্পষ্টভাবে দরিদ্রের সহায়ক করে তোলা দরকার। একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, দেশের গরিষ্ঠসংখ্যক মানুষ দারিদ্রে নিমজ্জিত থাকলে এবং আয় ও সম্পদের বৈষম্য সীমা অতিক্রম করলে, দেশের উন্নতিও থমকে যায়। সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে আয় ও সম্পদের বৈষম্য কমাতে সকলেরই তৎপর হওয়া প্রয়োজন।